আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন

অধ্যাপক গোলাম আযম

গোড়ার কথা

সব দেশে ও সব কালেই সমাজের সব স্তরে আইন ও শাসনের দরকার বলে সবাই স্বীকার করে। স্বামী ও স্ত্রী মিলে মাত্র দু'জন লোকের যে ক্ষুদ্র সমাজ 'পরিবার' নামে পরিচিত– সেখানেও উভয়কে কতক নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয় এবং একজনকে শাসকের ভূমিকা পালন করতে হয়। রাষ্ট্র হলো সবচেয়ে বড় ও সংগঠিত সমাজ। আইন–কানুন ছাড়া কোন রাষ্ট্র চলতেই পারে না। আর যেহেতু আইন নিজেই চালু হতে পারে না, সেহেতু শাসন ব্যবস্থা অবশ্যই দরকার।

আইন যদি সুবিচারমূলক ও নিরপেক্ষ না হয়, তাহলে সমাজে যুলুম ও অবিচার চলে। কিন্তু আইন যত ভালই হোক, যদি শাসকগণ সৎ না হয়, তাহলে আইনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। শাসক অসৎ হলে একটি ভাল আইনও অন্যায়ের হাতিয়ারে পরিণত হয়। দুর্নীতি দমনের আইন দুর্নীতিবাজ অফিসারের মাধ্যমে চালু হতে পারে না। সে ঐ আইনের সুযোগ নিয়ে আরও বড় ধরনের দুর্নীতি চালু করে।

আমাদের দেশে খুন ও ডাকাতি দমনের উদ্দেশ্যে আইন আছে। কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ দারোগা, পুলিশ ও প্রশাসক ঐ আইন চালু না করে খুনী ও ডাকাতদের মুরুব্বীর ভূমিকা পালন করলে ঐ আইন অচল হতে বাধ্য।

আইনের মধ্যে ফাঁক–ফোকর ও দোষ–ত্রুটি থাকলেও শাসক যদি সৎ হয়, তাহলে মানুষ মোটামুটি ইনসাফ পেতে পারে। আর যদি আইন ত্রুটিমুক্ত হয় এবং শাসকও সৎ হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। তাই ভাল আইন ও সৎ শাসনের দাবী সব মানুষেরই প্রাণের দাবী। অথচ মানব সমাজে এ দুটোর অভাবই সবচেয়ে বেশী। বিশেষ করে সৎ লোকের শাসনের অভাব মানব জাতির সবচেয়ে বড় সমস্যা।

মানুষ জন্মগতভাবে অসৎ হয়ে পয়দা হয় না, একথা ঠিক। কিন্তু কোন মানুষই আপনা আপনি সৎ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। সে যে মানের পরিবার, সমাজ ও পরিবেশে ছোট থেকে বড় হয় সে মানেই সে

www.bjilibrary.com

গড়ে ওঠে। বিনা পরিকল্পনায় সৎ লোক গড়া সম্ভব নয়। এক খন্ড জমি নিজে নিজে একটা জংগলে পরিণত হয়। সেখানে ফুল বা ফলের বাগান বিনা পরিকল্পনায় গড়ে উঠবে না।

সব মানুষই সুখে-শান্তিতে থাকতে চায়। ভাল আইন ও সৎ লোকের শাসন ছাড়া এ আশা পূরণ হতে পারে না। তাই এ বিষয়টা প্রত্যেকের সবচেয়ে জরুরী চাহিদা। কিন্তু দুনিয়ায় এরই সবচেয়ে বেশী অভাব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতটুকু উন্নতি হয়েছে, তাতে এ অভাব পূরণের বদলে আরও বেড়ে গেছে। তাই ঠান্ডা মাথায় এ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করা কর্তব্য।

আইন কাকে বলে?

দেশকে নিয়ম-শৃংখলার সাথে পরিচালনার জন্য যে বিধি-বিধান দরকার তাকেই আইন বলা হয়। কিন্তু এ আইন কোথায় পাওয়া যায়? আইনের সর্বসম্মত সহজ সংজ্ঞা হলোঃ Law is the will of the sovereign- সার্বভৌম সত্তার ইচ্ছাই আইন। এর সহজ অর্থ হলো, দেশে চূড়ান্ত ফয়সালা দেবার ক্ষমতা যার হাতে আছে, তার যা মরযী তা-ই আইনের মর্যাদা পায়। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ক্লাব, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির পরিচালকগণ যে সব বিধি-বিধান রচনা করেন তা আইনের মর্যাদা পায় না। দেশের আইন ঐ সব প্রতিষ্ঠানের কোন বিধানকে বে-আইনী ঘোষণা করতে পারে। আইন ঐসব বিধানকে বলা হয়, যা দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক রচনা করে।

বর্তমান যুগে জনগণকেই রাষ্ট্রের মালিক বলে স্বীকার করা হয়। তাই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা যে আইন সভা গঠিত হয় এর হাতেই দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আছে বলে মেনে নেয়া হয়। এ কারণেই এর নাম দেয়া হয়েছে Legislature বা আইন পরিষদ। এ ধরনের সংস্থার ইচ্ছাই আইন। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ আইন রচনার এ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

www.bjilibrary.com

আইন দু' প্রকার

সাধারণভাবে আইনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। দেশের শাসনতন্ত্রকে মৌলিক আইন বলা হয়। আইন পরিষদ যত সহজে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন আইন পাস করতে পারে, তত সহজে শাসনতন্ত্রের কোন আইন বদলাতে পারে না। এ হিসাবে আইন দু' প্রকারঃ মৌলিক ও সাধারণ।

মৌলিক আইন বা শাসনতন্ত্র জনগণের প্রতিনিধিরাই রচনা করেন বটে, কিন্তু এ আইন পরিবর্তন করতে হলে আইন সভার তিন ভাগের দু'ভাগ সদস্যের সমর্থন দরকার। কিন্তু সাধারণ আইন শতকরা ৫১ জনের সমর্থনেই পাস হতে পারে।

শাসনতন্ত্রের এ মর্যাদা রয়েছে যে, এর বিরোধী কোন আইন পাস করার ক্ষমতা আইন সভারও নেই। তেমনিভাবে আইন সভার রচিত কোন বিধানের বিরোধী কোন বিধি দেশের আর কোন প্রতিষ্ঠান রচনা করলে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। শাসনতন্ত্রই হলো দেশের বুনিয়াদী আইন। আইন পরিষদকেও শাসনতন্ত্রের আনুগত্য করতে হয়। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ শাসনতন্ত্র অনুযায়ীই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। অবশ্য শাসনতন্ত্রের বিরোধী নয় এমন যে কোন আইন তৈরী করার ক্ষমতা আইন সভার রয়েছে।

আইন নির্ভুল হয় না কেন?

মৌলিক আইনই হোক আর সাধারণ আইনই হোক, সব আইনই জনগণের স্বার্থের সাথে জড়িত। আইনই নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে। তাই আইনে যদি ভুল বা ত্রুটি থাকে, তাহলে জনগণকেই এর মাসুল দিতে হয়। তাই আইন এমন হতে হবে যাতে সব নাগরিকের নৈতিক সমর্থন এর পক্ষে থাকে। তবেই মানুষ মনের তাকিদেই আইন মেনে চলবে।

www.bjilibrary.com

কয়েকটি কারণে আইনে ভুল-ক্রুটি থাকেঃ

১। যারা আইন রচনা করে, তারা যদি সব মানুষের কল্যাণের বদলে কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বার্থে আইন তৈরী করে। যেমন বৃটিশ শাসনামলে মুসলিম জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন তৈরী করা হয়েছিল।

২। যদি দেশের বেশীর ভাগ লোকের ঈমান-আকীদা বিরোধী আইন তৈরী করা হয়। যেমন ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে এদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

৩। যাদের হাতে সরকারী ক্ষমতা রয়েছে, তারা যদি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শক্তি বলে ক্ষমতায় টিকে থাকার বদ নিয়তে কোন আইন রচনা করে। যেমন ১৯৭৪ সালে দেশের নিরাপত্তার নামে বিনা বিচারে সরকার বিরোধী লোকদেরকে জেলে আটকে রাখার উদ্দেশ্যে আইন করা হয়েছিল। এবং ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন কায়েম করে বিরোধী সব দলকে বে-আইনী করা হয়েছিল।

৪। সঠিক জ্ঞানের অভাবেও ক্ষতিকর আইনকে ভাল মনে করে রচনা করা হয়ে থাকে। যেমন সাম্যবাদের দোহাই দিয়ে এক সময় রাশিয়ায় মার্কসবাদের ভিত্তিতে দেশ গড়ার আইন রচনা করা হয়েছিল। ঐ আইনের ভুল বুঝতে পেরে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের জনগণ বর্তমানে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছে।

৫। এক সময় যে আইন ভাল বলে চালু করা হয় পরবর্তী কালে অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ হয় যে তা ভাল ছিল না। যেমন আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নামে শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। কয়েক বছর পরই এর ভুল বুঝতে পেরে তিনি তা বদলাতে রাযী হয়ে গেলেন।

www.bjilibrary.com

এ সব ঘটনা প্রমাণ করে যে, গোষ্ঠী স্বার্থ, আদর্শিক বিচার, সঠিক জ্ঞানের অভাব, ভবিষ্যতের পরিণাম না জানা এবং অন্যায়ভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার কারণেই যুগে যুগে দেশে দেশে নির্ভুল আইন রচনা করা সম্ভব হয়নি।

নির্ভুল আইন কে দিতে পারে?

নবী ও রাসূলগণ এবং তাঁদের সত্যিকার অনুসারিগণ মানব জাতিকে এ কথাই বুঝাবার চেষ্টা করে গিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নির্ভুল আইন দিতে পারে না। কারণঃ

১। একমাত্র তিনিই সব কালের জ্ঞান রাখেন এবং ভবিষ্যতের পরিণাম জানেন।

২। একমাত্র তিনিই নিঃস্বার্থ এবং নিরপেক্ষ। তাই তাঁর আইন ছাড়া সত্যিকার ইনসাফ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

৩। তিনি অন্যায়, অবিচার ও যুলুম পছন্দ করেন না বলেই তাঁর আইন কোন গোষ্ঠীকে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার সুযোগ দেয় না।

এ কারণেই প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ পাক মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন, এমন কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের জন্য কুরআনুল হাকীমে যে সব আইন দিয়েছেন এবং রাসূল (সাঃ) ঐ সব আইন বাস্তবে মানব সমাজে চালু করে যেভাবে ঐ সব আইনের কল্যাণকর হওয়া প্রমাণ করে গেছেন, তার ফলে আজ গোটা বিশ্বে আল্লাহর আইনের পক্ষে জোরদার আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

ফেরআউন ও নমরূদ থেকে আরম্ভ করে এ যুগের হিটলার ও মুসোলিনীদের রচিত আইন কোন দেশেই নতুন করে চালু করার আন্দোলন গড়ে উঠেনি। রাশিয়ায় কমিউনিজমের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর

www.bjilibrary.com

আর কোন দেশে এর পক্ষে আন্দোলন নতুন করে দানা বাঁধবে না।

কিন্তু আল্লাহর আইনের পক্ষে আন্দোলন কোন কালেই বন্ধ হয়নি এবং কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। যারা নৈতিক জীব হিসাবে মানুষের উন্নয়ন কামনা করে, যারা প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মানব জাতিকে উদ্ধার করতে আগ্রহী, সব মানুষের ন্যায্য অধিকার বহাল করে যারা দুনিয়ায় শান্তি কায়েম করতে চায়, তারা সব দেশে সব কালেই আল্লাহর আইন চালু করার আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

আর যারা নিজেদের নৈতিক সত্তাকে পংগু করে রেখে দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধের মজা লুটবার চেয়ে বড় কোন উদ্দেশ্য জীবনে পোষণ করে না, তারা আল্লাহর আইনকে তাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী মনে করবেই।

আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম সত্তা

"সার্বভৌম সত্তার ইচ্ছাই আইন"- এ কথাটি বাস্তব সত্য হলেও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে সার্বভৌমত্ব কোথায় আছে(Location of sovereignty) সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। সার্বভৌম শক্তি কি জনগণের হাতে, না পার্লামেন্টের হাতে-এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রখ্যাত রাষ্ট্র বিজ্ঞানী প্রফেসার হেরলড জেঃ লাস্কী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "গ্রামার অব পলিটিক্স"-এ শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, সার্বভৌম শক্তির অস্তিত্ব আসলেই অনুপস্থিত।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানে সার্বভৌম সত্তার যে সব বৈশিষ্ট্য সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন, তা বাস্তবে কোথাও নেই। যুক্তির ধোপে একথা টিকে না যে জনগণ, পার্লামেন্ট বা কিং সার্বভৌম শক্তির ধারক। কারণ এদের কেউ চিরস্থায়ী, সর্বব্যাপী, অবিভাজ্য, অহস্তান্তরযোগ্য, অবিমিশ্র ও চরম স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম নয়। অথচ এ সবকেই সার্বভৌম সত্তার বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করা হয়।

সত্যিকার বিশ্লেষণে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই মধ্যে পাওয়া যায়। আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহর মধ্যেই ঐ সব গুণাবলী রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহর আইনকে সার্বভৌম সত্তার ইচ্ছা হিসাবে মেনে নিলে পার্লামেন্টেরও আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে কোন আইন রচনা করার অধিকার থাকে না।

"সার্বভৌম সত্তা কোথায় আছে"? অর্থাৎ (Location of sovereignty) নামে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে যে সমস্যা আছে এর একমাত্র সমাধানই আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেয়া। সার্বভৌমত্ব নেই বললে এ সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয় মাত্র।

আল্লাহর আইন মানে কী?

ইসলাম বিরোধীদের কুপ্রচারণার ফলে সাধারণভাবে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, আল্লাহর আইন মানে চোর-ডাকাতের হাত কাটা, যিনাকারকে সংগেসার (পাথর মেরে হত্যা) করা, মদখোরকে বেত মারা, সুদখোরকে জেলে দেয়া ইত্যাদি। সমাজে চুরি-ডাকাতি, যিনা, মদ, সুদ, জুয়া ইত্যাদি ব্যাপক হওয়ায় বহু লোক এ সব মন্দের সাথে জড়িত। তাই ইসলাম বিরোধীরা এ সব লোককে আল্লাহর আইন কায়েমের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার হীন উদ্দেশ্যেই এ অপপ্রচার চালায়।

অথচ আল্লাহর আইনের উদ্দেশ্য হলো সমাজকে এমনভাবে গঠন করা যাতে জনগণের মন-মগজ-চরিত্র আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সঃ)-এর তরীকা মতে জীবন যাপনের সুযোগ পায়। মানুষ ভাত, কাপড়, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির অভাবে যেন অসৎ পথে চলতে বাধ্য না হয়। বিয়ে ছাড়া যেন নারী-পুরুষের অবৈধ মিলনের কারণ ও সুযোগ না ঘটে। যে সব কুঅভ্যাস সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে, তা থেকে জনগণকে যাতে রক্ষা করা যায়।

www.bjilibrary.com

সাধারণ শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা, প্রচার ও গণশিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্য করার যোগ্য বানানোই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। জনগণের মৌলিক প্রয়োজন যাতে পূরণ হয় এবং মানুষ যাতে অভাবের কারণে কুপথ বেছে না নেয়, সে ব্যবস্থা করাও সরকারের কর্তব্য। হালাল পথে রোযগার করার সুযোগ দান করে হারাম পথ বন্ধ করাও সরকারেরই দায়িত্ব।

এত সব ব্যবস্থার পরও যারা চুরি-ডাকাতি, যিনা, মদ, ঘুষ, জুয়া ইত্যাদি সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়, তাদের জন্য কুরআন কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে যাতে মানুষ এ সব কুকর্মের সাহস না পায়। এ সব ঘৃণ্য কাজ ছাড়া যারা দুনিয়ার জীবনটা নিরস মনে করে তারাই ইসলামের ফৌজদারী আইনকে 'বর্বর' বলতে পারে।

জনগণের চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা এবং মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের বন্দোবস্ত করার জন্য আল্লাহ তাআলা যে সব আইন দিয়েছেন, তা সমাজে জারী না করে শুধু শাস্তি দেবার আইন জারী করার অধিকার কোন সরকারের নেই।

কোন লোককে কাতুকুতু দিয়ে হাসতে বাধ্য করার পর তাকে হাসার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেমন হাস্যকর, তেমনি-নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং যৌন উত্তেজনাকর পত্র-পত্রিকা ও সিনেমার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করে যিনার শাস্তি দেয়াও চরম অবিচার। অভাবের কারণে কেউ চুরি করেছে বলে প্রমাণিত হলে তাকে শাস্তি দেবার অধিকার ইসলাম দেয়নি।

ইসলামী আইন এমন সুন্দর সমাজ কায়েম করার জন্যই দেয়া হয়েছে যেখানে সবাই নিরাপত্তা বোধ করবে এবং সুখে-শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ পাবে। সত্যিকার ইনসাফ কায়েম করাই আল্লাহর আইনের আসল উদ্দেশ্য বলে সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন।

www.bjilibrary.com

ঐ আয়াতের মিযান শব্দটি থেকেই জামায়াতে ইসলামী দাঁড়ি পাল্লাকে দলীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছে। কারণ দাঁড়ি পাল্লা ইনসাফ বা সুবিচারের প্রতীক হিসাবে সারা দুনিয়ায় পরিচিত।

আল্লাহর আইনের উৎস

আল্লাহর আইনের মূল উৎস আল্লাহ নিজেই। এমন কোন আইন আল্লাহর আইন বলে গণ্য হতে পারে না, যা আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি। এ মূলনীতির ভিত্তিতে আল্লাহর আইনের উৎস কয়েকটি রয়েছেঃ

১। কুরআনই হলো আল্লাহর আইনের প্রধান উৎস। কারণ কুরআনের ভাব ও ভাষা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে।

২। রাসূলের সুন্নাহ হলো দ্বিতীয় প্রধান উৎস। আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর ওয়াহীর ভিত্তিতে রাসূল (সাঃ) তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তারই নাম সুন্নাহ। একমাত্র সুন্নাহই কুরআনের সরকারী, সঠিক ও নির্ভুল ব্যাখ্যা।

৩। আছারে সাহাবা হলো আল্লাহর আইনের তৃতীয় উৎস। খোলাফায়ে রাশেদীন রাসূল (সাঃ)-এর প্রতিনিধি হিসাবে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজকে পরিচালনা করতে গিয়ে যে বাস্তব শিক্ষা রেখে গেছেন, তা অনুসরণযোগ্য বলে রাসূল (সাঃ) স্বয়ং সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন। এ ছাড়াও কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে সাহাবা কিরাম (রাঃ) থেকে যতটুকু জ্ঞান হাদীসে পাওয়া যায়, তা অবশ্যই গুরুত্বের দাবী রাখে।

৪। এ কয়টি উৎসকে ভিত্তি করে ফিকাহর ইমামগণ ইসলামী আইনের যে বিপুল সম্পদ রেখে গেছেন, তা চিরকালই ইসলামী আইন রচনার নির্ভরযোগ্য সহায়ক।

www.bjilibrary.com

ফিকাহর ইমামগণ যে সব বিষয়ে একমত হয়েছেন, তাকেও উৎস হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়। ইসলামী পরিভাষায় এর নাম হলো ইজমা।

আল্লাহর আইনের এ চারটি উৎসকে মেনে নিয়ে কোন আইন সভা যদি আইন রচনা করে, তাহলে তা ইসলামী আইন বলে গণ্য হতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের আইন সভার এটাই দায়িত্ব। এই আইন সভার এমন কোন আইন রচনার অধিকার নেই, যা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী বলে সাব্যস্ত হয়। কোন আইন কুরআন–সুন্নাহ বিরোধী কিনা তা সাব্যস্ত করার জন্য ইসলামী আইনে পারদর্শী বিশেষ সংস্থা থাকতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের একটি ডিভিশনের উপরও এ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

সৎ লোকের শাসন ছাড়া সব আইনই অচল

আল্লাহর আইন আমাদের দেশে নেই। কিন্তু যে আইনই আছে তাও ঠিক মতো জারী হচ্ছে না। এর আসল কারণই হলো অসৎ লোকের শাসন। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

১। যাদের আয় মোটামুটি বেশী, তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে আয়কর নেবার অধিকার সরকারকে দিয়ে আইন রচনা করা হয়েছে। কিন্তু যে পরিমাণ আয়কর সরকারী তহবিলে জমা হওয়া উচিত তা হয় না। কারণ আয়কর অফিসের কর্মচারীরা করদাতার দেয়া আয়ের হিসাব সত্য বলে বিশ্বাস না করে করের পরিমাণ কয়েকগুণ বেশী ধার্য করে দেয়। এর ফলে করদাতারা সত্য হিসাব না দিয়ে আসল আয়ের অনেক কম দেখায়। এ অবস্থায় এক শ্রেণীর আয়কর উকীল করদাতা ও অফিসারের মাঝখানে দালালী করে মীমাংসায় পৌছায়ে দেয়। এ মীমাংসার ফলে সরকারী তহবিলে আয়কর যে পরিমাণ জমা হওয়া উচিত এর চেয়ে কম জমা হয়। আর অন্যায়ভাবে করদাতা, আয়কর অফিসার ও দালাল অবৈধভাবে লাভবান হয়। অফিসার ঘুষ নিয়ে করদাতার মিথ্যা হিসাব সত্য বলে মেনে নেয়। করদাতা ঘুষ দিয়ে

www.bjilibrary.com

ন্যায্য আয়করের এক অংশ কম দিয়ে বেঁচে যায়। আর উভয় পক্ষকে অবৈধ কাজে সাহায্য করার ফীস বাবত দালালও রোযগার কামাই করে নেয়।

এখানে সরকারী অফিসারই এক নম্বর দোষী। ব্যক্তিগত স্বার্থে সে সরকারী দায়িত্বে অবহেলা করে। যদি করদাতারা সঠিক হিসাব দেয় এবং অফিসাররা ঘুষ না খায়, তাহলে আয়করের হার অনেক কম হলেও সরকারী আয় যথেষ্ট হতে পারে।

২। ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য সরকার গম, চাউল, টাকা ইত্যাদি বরাদ্দ করে। যে অফিস থেকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে এ সব জিনিস সরবরাহ করা হয়, সে অফিসের কর্মচারীরা এ সব জিনিস বিলি করার সময় যদি বিশেষ হারে ঘুষ আদায় করে, তাহলে আইনমত চেয়ারম্যান যে পরিমাণ জিনিস ও টাকা পাওয়ার কথা তা থেকে কম নিতে বাধ্য হয়। যদি অফিসাররা চুরি করা শিক্ষা দেয় তাহলে চেয়ারম্যানরাও দুর্নীতি করার সাহস পায়।

৩। আইনে আছে যে, খুনীকে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দারোগা, পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঘুষ দিয়ে খুনী বেঁচে যায়। অথচ কত নির্দোষ লোক খুনের মিথ্যা মামলায় জেলে পড়ে আছে। এটাও ঘুষের কেরামতী।

উদাহরণের বেশী দরকার নেই। দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও ঘুষের রাজত্ব সর্বত্র। আইন চালু করা যাদের দায়িত্ব, তারাই যদি অসৎ হয় তাহলে কোন আইনই কাজে আসে না। সৎ লোকের অভাবে আজ মানুষ আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

www.bjilibrary.com

আইনের শাসন

আইন থাকা সত্ত্বেও আইনের সঠিক ব্যবহার না হলে এর সুফল পাওয়া যায় না। আইন আছে অথচ শাসকদের মনগড়া শাসন চলে। তাই আইন যাতে শাসকের ভূমিকা পালন করতে পারে এর ব্যবস্থা প্রয়োজন। এরই নাম আইনের শাসন।

আইনের দাবী হলোঃ

১। সবার উপর আইন সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সরকারী পদস্থ লোক আইনের নাগালের বাইরেই থাকতে চেষ্টা করে। তাই সে অন্যায় করেও শাস্তি পায় না। সাধারণ লোক সহজেই শাস্তি পায়। এটা আইনের শাসন নয়। আইনের চোখে সবাই সমান হতে হবে। রাষ্ট্র প্রধানও যেমন আইনের উর্ধে না থাকে।

২। আইন অনুযায়ী পরিচালিত আদালতে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষই নির্দোষ। বিনা বিচারে আটক করা বা শাস্তি দেয়া আইনের শাসন নয়।

আইনের শাসন কায়েম করতে হলে সৎ লোকের শাসন প্রয়োজন। আইন নিজে নিজে জারী হতে পারে না. যারা আইন জারী করার দায়িত্বে আছে তাদেরকেই শাসক বলে। শাসক যদি অসৎ হয়, তাহলে আইন সঠিক নিয়মে জারী হবে না। অসৎ শাসক আইনকে ফাঁকি দিয়ে বেআইনীভাবেই শাসন করার অপচেষ্টা করে থাকে।

খোলাফায়ে রাশেদীন যেভাবে নিষ্ঠার সাথে আইন জারী করেছেন ঐ আইন বহাল থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী যুগে সব শাসক সমান মানে আইন জারী করেননি।

আমাদের দেশে শাসকদেরকেই প্রধান আইন ভংগকারীর ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। এ অবস্থায় আইনের শাসন কায়েম হতে পারে না।

www.bjilibrary.com

সবচেয়ে বড় সত্য কথা হলো যে, দুনীতি উপর থেকেই 'নাযিল' হয়। সরকারী ক্ষমতা যাদের হাতে, তারা সৎ হলে নীচের দিকে ক্রমে সততা চালু করা সহজ হয়। আজ দুর্নীতি ব্যাপক হবার মূল কারণ এটাই যে, সরকার পরিচালকরা বহু বছর থেকে এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে।

তাই সততা চালু করতে হলে নীচ থেকে শুরু করা সম্ভব নয়। সরকার পরিচালনার প্রধান নেতৃত্ব সৎ না হওয়া পর্যন্ত দুর্নীতি কোথাও বন্ধ করা যাবে না। প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিগণ এবং জাতীয় সংসদের সদস্যগণ যদি সত্যিকার সৎ ও চরিত্রবান হন, তাহলে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সততা চালু করা সম্ভব। সৎ লোকের চারিত্রিক প্রভাবে অধীনস্থ লোকেরা সৎ হবার প্রেরণা পায়। মানুষ সহজাতভাবেই নৈতিক জীব। নীতিবান লোকের হাতে নেতৃত্ব থাকলে এর সুফল নীচের দিকেও দেখা যায়।

সৎ লোক কাকে বলে?

সমাজে সৎ লোকের বড়ই অভাব। কিন্তু যারা সৎ নয়, তারাও সৎ লোককে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে। কোন চোর তার চুরির মাল আর এক চোরের কাছে আমানত রাখে না, কোন সৎ লোকের কাছেই রাখে। অসৎ লোকও সৎ লোকের প্রশংসা করে। তারা নিজে অসৎ হলেও সততা কী তা জানে।

আল্লাহ পাক মানুষকে ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝবার যোগ্যতা দিয়েছেন। এ যোগ্যতা আর কোন জীব-জানোয়ারের নেই। এরই নাম বিবেক। বিবেকই আসল মানুষ। এটাই মানুষের নৈতিক সত্তা। মানুষের দেহ হলো বস্তুসত্তা। দেহের ভাল-মন্দের কোন ধারণা নেই। দেহের যা দাবী সে তা পেলেই খুশী। তা কি হালাল পথে পেল কিনা সে হিসাব সে করে না। বিবেকই সে হিসাব করে। কুরআন পাক এর নামই দিয়েছে রূহ, আর দেহের দাবীগুলোকে নাফস বা হাওয়া নাম দিয়েছে।

সব মানুষই এ কথার সাক্ষী যে, রূহ ও নাফসের মধ্যে হামেশাই লড়াই চলছে। ভাল-মন্দ বিচার না করে নাফস সব কিছুই চায়। বিবেক

www.bjilibrary.com

ভাল–মন্দ বিচার করে মন্দের ব্যাপারে বাধা দেয়। যার বিবেক দুর্বল সে নাফসকে মন্দ থেকে ফিরাতে পারে না। এদেরকে অসৎ লোক বলা হয় যাদের বিবেক সবল তারাই সৎ লোক। তারা নাফসকে দমন করতে চেষ্টা করে।

তাহলে একথা প্রমাণিত হলো যে, সৎ লোক তারাই, যারা বিবেকের দ্বারা পরিচালিত। অর্থাৎ

১। তারা বিবেকের বিরুদ্ধে চলে না।
২। যেটাকে ঠিক মনে করে নাফসকে তা করতে বাধ্য করে।
৩। মুখে যা স্বীকার করে বাস্তবে তা পালন করে।
৪। কারো ভয়ে বা ভালবাসার কারণে অন্যায় করে না।
৫। কখনও বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু করলে অনুতাপ করে এবং আর এমন করবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। এরই নাম তাওবা।

সৎ লোক কোথায় পাওয়া যাবে?

সৎ লোক আসমান থেকে রেডীমেড নাযিল হয় না। বিদেশ থেকে আমদানী করে আনার জিনিসও এটা নয়। সুপরিকল্পিত উপায়েই সৎ লোক তৈরী করতে হয়।

রাসূল (সাঃ) মাক্কার অসভ্য বর্বর সমাজে আল্লাহর আইন মানবার দাওয়াত দেবার ফলে যারা এ দাওয়াত কবুল করলেন, তাদেরকেই তিনি সৎ লোক হিসাবে গড়ে তুললেন।

আল্লাহ পাক মানুষকে যে বিবেকশক্তি দিয়েছেন, তার ফলে যারা মন্দ কাজ করে তারাও মন্দকে মন্দ বলেই জানে। যা ভাল সেদিকে বিবেকের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাই যাদের বিবেক মরে যায়নি, তারা ভাল হয়ে চলার পথ পেলে সে পথে চলতে চায়। দুর্বল মনের লোকেরা সে পথে চলার বাধা দেখে এগুতে সাহস পায় না। সাহসী লোকেরাই হিম্মত করে এগিয়ে আসে। এমন কি তারা এ পথের সকল বাধা উপেক্ষা করে বিরুদ্ধ শক্তির সাথে লড়াই করে সততার পথে টিকে থাকে।

www.bjilibrary.com

রাসুল (সাঃ)-এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কিরামের মাক্কী যুগের তেরটি বছরের সংগ্রামী জীবন এ কথারই সাক্ষী। আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের নেতৃত্ব কবুল করে যারা আল্লাহর আইনের পক্ষে এবং মানুষের মনগড়া আইন উৎখাত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে বিরোধী শক্তির যুলুম ও নির্যাতন সহ্য করতে রাযী ছিলেন, তারাই মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন। সৎ লোকের এ টীম বিনা পরিকল্পনায় ও বিনা চেষ্টায় তৈরী হয়নি। সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে হলে আজও ঐ নিয়মেই লোক তৈরী করতে হবে।

সৎ লোক তৈরীর পদ্ধতি

মানুষের দেহসত্তার উপর বিবেকসত্তার নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য আল্লাহ পাক যে পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আর কোন উপায়ে সত্যিকারের সৎ লোক তৈরী করা সম্ভব নয়। সে পদ্ধতির পয়লা বিধান হলো ঈমান। যে সৎ হতে আগ্রহী তাকে পয়লাই তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের উপর ঈমান আনতে হবে। এর সহজ মানে হলো এক আল্লাহর হুকুম মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর তরীকা মত আল্লাহর হুকুম এমনভাবে মানতে হবে যেন আখিরাতে আল্লাহর কাছে দোষী সাব্যস্ত হতে না হয়।

যে ঈমান আনল, তাকে পাঁচ ওয়াক্ত জামায়াতে নামায ও রমযানের রোযার মাধ্যমে এমন ট্রেনিং নিতে হবে যা তাকে তার দেহের গোলামী থেকে উদ্ধার করে আল্লাহর গোলামে পরিণত করবে এবং তার দুনিয়াদারীর কাজকেও ইবাদত বানিয়ে দেবে।

দেহের উপর বিবেকের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করতে হলে এ জাতীয় ঈমানদারদেরকে সংগঠনভুক্ত হয়ে সম্মিলিত চেষ্টায় নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে হবে। জামায়াতবদ্ধ জীবন ছাড়া অনৈসলামী সমাজের প্রভাব থেকে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই। রাসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বে

www.bjilibrary.com

সাহাবায়ে কিরাম জামায়াতবদ্ধ না হলে নিজেদেরকে এভাবে গড়তে পারতেন না।

মানুষ সৎ হতে চায়

আমাদের দেশের সব লোকই অসৎ নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে সৎ লোকের নেতৃত্ব না থাকা সত্ত্বেও সমাজে এমন যথেষ্ট লোক রয়েছে যারা সৎ থাকার চেষ্টা করে এবং সৎ হবার সুযোগ তালাশ করে।

মাদ্রাসার মাধ্যমে যে বিরাট সংখ্যক উলামা তৈরী হচ্ছেন, তাদের মধ্যে কুরআন-হাদীস অধ্যয়নের কারণেই সৎ থাকার প্রবল আগ্রহ থাকে। সাধারণ শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও অনেকে সৎ হবার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু অসৎ সমাজ ও পরিবেশ কাউকেই সহজে সৎ থাকতে দেয় না।

প্রায় সকল পর্যায়ের নেতৃত্বেই অসৎ লোকদের প্রাধান্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি থাকার কারণে কেউ বিবেকের তাকিদে সৎ থাকার চেষ্টা করলেও এ সংগঠিত অসৎ শক্তির সামনে টিকে থাকতে পারে না। সৎ থাকতে আগ্রহী যারা মাদ্রাসা, খানকাহ, তাবলীগ ও মসজিদের সীমাবদ্ধ এলাকায় কিছুটা সংগঠিত আছে, তারাও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ময়দানে অসংগঠিত থাকায় সুসংগঠিত অসৎ নেতৃত্বের মোকাবিলা করতে পারছে না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সৎ লোক তৈরী করার ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে যারা সৎ থাকতে চায়, তারাও সংগঠিত না হওয়ায় অসৎ নেতৃত্বের সামনে অসহায়।

সৎ লোকেরা যোগ্য হবার সুযোগ পাচ্ছে না

যোগ্য লোকেরা পরিবেশগত বহু কারণে বেশীর ভাগই সৎ থাকতে পারছে না। অথচ সর্বক্ষেত্রে তাদের হাতেই নেতৃত্ব। এরা এত যোগ্যতার সাথে নেতৃত্ব দিচ্ছে যে, সৎ লোকেরা কোথাও পাত্তা পাচ্ছে না। ফলে সৎ

www.bjilibrary.com

লোকেরা এত অযোগ্য থেকে যাচ্ছে যে, তারা নিজেদের সততাটুকুও হেফাযত করতে পারছে না।

অসৎ লোক যদি যোগ্য হয়, তাহলে যোগ্যতার সাথে অসৎ কাজই করে। আর সৎ লোক যদি যোগ্য না হয়, তাহলে এ সততা কোন কাজেই লাগে না। অসৎ লোকেরা রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজের সকল ময়দানে সুসংগঠিত। আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে যারা সৎ, তারাও এসব ময়দান অসৎ লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তারা রাজনীতির হাংগামা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকাই পছন্দ করেন। অসৎ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়ান না। যারা মাদ্রাসা, খানকাহ, তাবলীগ ও মসজিদে নিজেদের সততাটুকু নিয়ে কোন রকমে দুনিয়ার জীবনটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন, তারা রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দানে কোন স্থান না পাওয়ায় যোগ্যতা সৃষ্টির সুযোগ থেকে বঞ্চিতই হয়ে আছেন। যোগ্যতা কাজের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। শূন্যে যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দান এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব থেকে দূরে থেকে যোগ্যতা হাসিলের কোন উপায় নেই।

সৎ ও অসতে সংঘর্ষ অনিবার্য

সৎ ও অসৎ বা হক ও বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সৎ লোকেরা রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দানে অসৎ লোকদের সাথে প্রতিযোগিতায় আসে না। সৎ লোকদের মধ্যে যারা কয়েকটি বিশেষ কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন, অসৎ নেতৃত্বের সাথে তাদের কোন সংঘর্ষ হয় না। অসৎ নেতৃত্ব নিশ্চিন্ত যে, মাদ্রাসা, খানকাহ, তাবলীগ ও মসজিদে যারা আছেন, তারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দখল করতে পারবে না। কারণ তাদের কোন রাজনৈতিক কর্মসূচীই নেই।

দুনিয়ায় বিনা পরিকল্পনা ও বিনা কর্মসূচীতে কোন কাজ সমাধা করা যায় না। উলামায়ে কিরাম তৈরী করা মাদ্রাসার কাজ। আল্লাহওয়ালা

বানানো খানকার দায়িত্ব। আখিরাতমুখী মন তৈরী করা তাবলীগের উদ্দেশ্য। এভাবে যেটুকু কর্মসূচী যেখানে আছে সে অনযায়ী অবশ্যই লোক তৈরী হচ্ছে। কিন্তু ইকামাতে দীনের জন্য এ কর্মসূচী মোটেই যথেষ্ট নয়। এ কর্মসূচী দ্বারা যেটুকু কাজ হচ্ছে তা অবশ্যই দীনের বিরাট খেদমত।

কিন্তু অসৎ নেতৃত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের যে বিরাট ময়দান দখল করে আছে, সে ময়দানের জন্য সংগ্রামী বাহিনী তৈরীর উপযোগী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী ছাড়া অসৎ নেতৃত্ব উৎখাত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগে কোন কর্মসূচী নেই বলেই এসবের সাথে অসৎ নেতৃত্বের কোন সংঘর্ষ হয় না। অসৎ নেতৃত্ব তাদেরকে কোন বিকল্প শক্তি বলে গণ্যই করে না। বরং বিভিন্নভাবে তাদের পরোক্ষ সমর্থন নেবার সুযোগও পায়।

অবশ্য মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগে আল্লাহর আইন চালু করার পরিকল্পনা ও কর্মসূচী থাকলে সেখান থেকেও সংগ্রামী বাহিনী তৈরী হতে পারে। তেমন কর্মসূচী গ্রহণ করলে তাদের সাথেও বাতিল শক্তির সংঘর্ষ হবে।

ইসলামী আন্দোলনই অসৎ নেতৃত্বের একমাত্র চক্ষুশূল

জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর আইন কায়েমের উদ্দেশ্যে একদল সৎ ও যোগ্য নেতা গড়ার এবং জনগণকে আল্লাহর আইন মানতে সহায়তা করার জন্য চরিত্রবান কর্মী বাহিনী তৈরীর পরিকল্পনা নিয়ে এরই উপযোগী কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করছে বলেই সকল অসৎ নেতৃত্ব জামায়াতকে তাদের জন্য বিরাট হুমকি মনে করে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চালু থাকা সত্ত্বেও ইসলামী ছাত্রশিবির যে হারে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রে সমৃদ্ধ কাফেলা গড়ে তুলছে, তা অসৎ নেতৃত্বের জন্য রীতিমতো শংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে আদর্শহীন মহল যুক্তির বদলে শক্তি প্রয়োগ করছে।

www.bjilibrary.com

কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার অশালীন পরিবেশেও ইসলামী ছাত্রী সংস্থা ইসলামী মুল্যবোধের ভিত্তিতে ছাত্রীদের মধ্যে একদল সংগ্রামী মহিলা গড়ে তুলছে বলেই তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলছে। অথচ তারা বাস্তব জীবনে একথা প্রমাণ করেছে যে, ইসলামী পর্দা পদ্ধতি উচ্চশিক্ষা, প্রগতি ও আধুনিকতার পথে বাধা নয়।

শ্রমিক অংগনে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মেহনতী মানুষদেরকে পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী শোষকদের খপ্পর থেকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্য থেকেই সৎ ও চরিত্রবান নেতৃত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তাই তারাও অসৎ নেতৃত্বের চক্ষুশূল।

ইসলামী আন্দোলনের এ কয়টি সংগঠন দেশের সৎ লোকদের সংগঠিত করে পরিকল্পিত কর্মসূচী অনুযায়ী যোগ্য বানাবার চেষ্টা করছে। আর যোগ্য লোকদেরকে সংগঠিত করে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলছে।

যারা সততা নিয়ে টিকে থাকতে চান এবং দেশ থেকে অসৎ নেতৃত্ব উৎখাত করতে চান, তাদেরকে অবশ্যই সুসংগঠিত হতে হবে। জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির, ইসলামী ছাত্রী সংস্থা ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এ জাতীয় লোকদেরকে একটি ইতিবাচক শক্তিতে পরিণত করার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামের এ সম্ভাবনাময় শক্তির বিরুদ্ধে সকল বাতিল শক্তি যে মারমুখী ভূমিকা পালন করছে এটাই এ কথা প্রমাণ করছে যে, তারা এটাকেই বিপদ বলে গণ্য করে। হক ও বাতিলের এ সংঘর্ষ চিরন্তন। এ সংঘর্ষ ছাড়া আল্লাহর আইন কায়েমের যোগ্য লোক বাছাই করা ও গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এটাই আল্লাহর বিধান। এ কারণেই নবীগণকে বাতিলের মোকাবিলায় সংগ্রাম করতে হয়েছে।

এ সংগ্রামের মাধ্যমেই এমন একদল লোক তৈরী হবে, যাদের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণের জন্য আল্লাহ পাক সূরা নূরের ৫৫ নম্বর আয়াতে ওয়াদা করেছেন।

www.bjilibrary.com

সৎ লোক তৈরীর কর্মসূচী

বিনা চেষ্টায় সৎ লোক তৈরী হয় না। অসৎ হওয়ার জন্য চেষ্টা করা লাগে না। সৎ হবার চেষ্টা না করলেই অসৎ হয়ে যায়। যেমন কাপড় নিজে নিজেই ময়লা হতে থাকে। এর জন্য চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু বিনা চেষ্টায় কাপড় সাফ হয় না।

আল্লাহ তাআলা সৎ লোক তৈরী করার কর্মসূচী দিয়েই নবী ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। ঐ কর্মসূচী ছাড়া সত্যিকার অর্থে সৎ লোক তৈরী হতে পারে না।

এ কর্মসূচীর দুটো দিক রয়েছে-একটা হলো ইতিবাচক দিক। অপরটি নেতিবাচক। ইতিবাচক দিকে ৪ দফা কর্মসূচী রয়েছে যা কুরআন পাকে সূরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১ আয়াত, সূরা আলে ইমরানের ১৬৪ আয়াত ও সূরা জুমআর ২য় আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা জুমআ থেকে উল্লেখ করছিঃ অর্থাৎ তিনিই ঐ সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেনঃ

১। আল্লাহর আয়াতসমূহকে তাদের সামনে তিলাওয়াত করেন,
২। তাদের জীবনকে পাক-পবিত্র করেন,
৩। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দেন,
৪। তাদেরকে হিকমত শিক্ষা দেন।

এ ৪টি কাজের সামান্য ব্যাখ্যা দরকারঃ

১। রাসূল (সাঃ) হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর কাছ থেকে যেভাবে তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন শিখেছেন, তেমনি তিনিও সাহাবাগণকে তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন। লেখা বা অন্য কোন উপায়ে উচ্চারণ শেখান যায় না। এ কারণে শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করা কুরআন শেখার পয়লা জরুরী কাজ।

২। দ্বিতীয় কাজ ছিল সাহাবা কিরামের জীবন থেকে আল্লাহর অপছন্দনীয় সব কথা, কাজ ও অভ্যাস দূর করে তাঁদেরকে পবিত্র

www.bjilibrary.com

করা। রাসূল (সাঃ) তাঁদের প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখতেন (তাওয়াজ্জুহ)। যখনই তেমন কিছু লক্ষ্য করতেন যা সংশোধন করা দরকার, তখনই হিদায়াত দিতেন। এ কারণেই যেসব বিষয়ে তিনি আপত্তি করেননি তা সঠিক বলে গণ্য হতো। আর এ জন্যই রাসূল (সাঃ)–এর "তাকরীর" (অনুমোদন)–কেও হাদীস হিসাবে স্বীকার করা হয়।

৩। তৃতীয় কাজ ছিল কুরআন শিক্ষা দেয়া। রাসূল (সাঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের একমাত্র সরকারী ব্যাখ্যাতা। শুধু তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিলেই তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ হতো না। আল্লাহর কিতাবের মর্ম ও সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যাই একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যার বিরোধী কোন ব্যাখ্যাই শুদ্ধ বলে গণ্য হতে পারে না। যুগে যুগে নতুন নতুন যত ব্যাখ্যা করা হোক এমন কোন ব্যাখ্যা সঠিক বলে মানা যাবে না যা রাসূল (সাঃ)–এর ব্যাখ্যার সাথে খাপ খায় না।

৪। চতুর্থ কাজ ছিল "হিকমত" শিক্ষা দেয়া। রাসূল (সাঃ) নিজেই হিকমত অর্থ করেছেন "তাফাক্কুহ ফি'দ্–দীন"। অর্থাৎ দীন সম্পর্কে এতটা স্পষ্ট ধারণা দান করা যাতে তারা জীবনের সবক্ষেত্রে কুরআনের শিক্ষার আলোকে চলার যোগ্য হন। "তাফাক্কুহ" শব্দটি 'ফিক্হ" শব্দ থেকে গঠিত। ফিকাহর ইমামগণ দীনের স্পষ্ট ধারণা রাখতেন বলেই সব মাসায়েলের সঠিক জওয়াব তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী বাস্তব জীবনে চলতে হলে "তাফাক্কুহ ফি'দ্–দীন" জরুরী।

বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে যত রকম বাধার সৃষ্টি করা হয় এবং যত প্রকার অন্যায়– অত্যাচার চালান হয় এসবকে অগ্রাহ্য করে হকের উপর মযবুত হয়ে টিকে থাকাই নেতিবাচক কর্মসূচী। উপরোক্ত চার দফা শিক্ষাসূচী অনুযায়ী সাহাবা কিরামকে গড়ে তুলবার সাথে সাথে

www.bjilibrary.com

নেতিবাচক দিক দিয়ে বাতিলের মুকাবিলায় যুলুম–নির্যাতন সহ্য করে হকের উপর মযবুত থাকার শিক্ষা দেয়া না হলে সত্যিকার মুজাহিদ হিসাবে তারা গড়ে উঠতেন না। আল্লাহর আইন কায়েমের আন্দোলনে যারা সাড়া দিলেন, তাদেরকে শক্তির দাপটে দমন করার জন্য অসৎ নেতৃত্ব চেষ্টা করবেই। যারা এসব বাধার পরওয়া না করে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার হিম্মত করে তাদের মধ্য থেকেই সৎ নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়।

উপরোক্ত ৪ দফা ইতিবাচক শিক্ষা মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগের মাধ্যমে যেটুকু হচ্ছে তার সাথে নেতিবাচক শিক্ষা যোগ না করলে সৎ লোক তৈরীর আসল উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না। আল্লাহর আইন কায়েমের উদ্দেশ্যে জিহাদী জযবা নিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচী দেয়া না হলে বাতিলের পক্ষ থেকে কোন বাধা আসে না। হক ও বাতিলের সংঘর্ষ সম্পর্কে কুরআন পাকে যত নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগের প্রচলিত কর্মসূচীতে তা পালন করার কোন সুযোগ আসে না।

অথচ বাতিলকে উৎখাত করে অসৎ নেতৃত্বের জায়গায় সৎ নেতৃত্ব কায়েম করতে হলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় কর্মসূচীই সমানভাবে চালিয়ে যেতে হবে। জামায়াতে ইসলামী এ পূর্ণাংগ কর্মসূচীর মাধ্যমেই লোক তৈরী করছে।

সৎ লোকের শাসন

উপরোক্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক কর্মসূচীর মাধ্যমে তৈরী লোকদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব আসলেই সৎ লোকের শাসন কায়েম হয়েছে বলে বুঝা যাবে এবং একমাত্র তখনই আল্লাহর আইন চালু হওয়া সম্ভব হবে। সমাজ থেকে এ জাতীয় লোক ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই যোগাড় হয়ে থাকে।

যে সমাজে ইসলাম কায়েম নেই ঐ সমাজ থেকেই এ ধরনের লোক তালাশ করা সহজ। সমাজে ইসলাম কায়েম না থাকা সত্ত্বেও যারা

www.bjilibrary.com

ইসলামের জন্য দরদী হয়ে আন্দোলনে যোগদান করে, তারা ইসলাম বিরোধী শক্তির বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করতে গিয়ে বহু রকমের ত্যাগ ও কুরবানী দিতে বাধ্য হয়। এমনকি তাদের জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ সত্ত্বেও যারা আল্লাহর পথে মযবুত হয়ে টিকে থাকে, তারা একথাই প্রমাণ করে যে, তারা দীনের স্বার্থে সবকিছু ত্যাগ করতে পারে-তারা কোন অবস্থায়ই দীনের পথ ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়।

এ ধরনের লোকদের হাতে যদি শাসন ক্ষমতা আসে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা দীন কায়েম করতে চেষ্টা করবে। তারা দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করার জন্য আল্লাহর আইন অমান্য করবে না, ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে অন্যায় ও অবিচার করবে না, সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও হারাম পথে টাকাওয়ালা হবার চেষ্টা করবে না, অন্য লোকের হক নষ্ট করে স্বজনপ্রীতি করবে না এবং আখিরাতের লাভ বাদ দিয়ে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের চিন্তা করবে না। কারণ ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের মন, মগজ ও চরিত্র এমনভাবে গড়ে ওঠে যে, তারা দুনিয়ার লাভকে আখিরাতের চেয়ে বড় মনে করে না। যদি তাই করত, তাহলে আন্দোলনের জীবনে তারা দুনিয়ার সুবিধার জন্য বাতিলের সাথে আপোস করতে রাযী হতো।

আল্লাহর আইনের সুফল

রাসূল (সাঃ) মদীনায় ইসলামী সরকার গঠন করার পর একে একে আল্লাহর আইন চালু করায় সবাই যখন এর সুফল নিজের চোখে দেখতে পেল, তখন মদীনার বাইরেও আরব দেশের সব জায়গায় জনগণ দলে দলে ইসলাম কবুল করতে লাগল। এটাই স্বাভাবিক ছিল। কেননা সব মানুষই সুখ-শান্তিতে থাকতে চায়। তারা আল্লাহর আইন চালু হবার আগে সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলার যাতনা সহ্য করেছে। আল্লাহর আইন

www.bjilibrary.com

জারী হবার পর তারা এর সুফল দেখে সহজেই বুঝতে পারল যে, দুনিয়ার জীবনে যতটুকু সুখ-শান্তি ইসলামী রাষ্ট্রে পাওয়া গেল তা এর আগে কখনও তারা পায়নি।

কিন্তু আল্লাহর আইন নিজে নিজেই চালু হতে পারে না। রাসূল (সাঃ) তের বছর চেষ্টা করে যে একদল সৎ লোক তৈরী করেছিলেন, তাদের হাতেই আল্লাহর আইন জারী হলো। এ লোকগুলো ইসলাম বিরোধীদের যুলুম-অত্যাচার সহ্য করে এবং সব রকম বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে একমাত্র আখিরাতে আল্লাহর মেহেরবানী ও বেহেশত পাওয়ার আশায় নিজেদেরকে ঈমান, ইলম ও আমল দ্বারা গড়ে তুলেন। দুনিয়ার আরাম আয়েশের লোভ থাকলে তারা এত কষ্ট সহ্য করতে রাযী হতেন না।

যখন এ ধরনের সৎ লোকের শাসন কায়েম হয়, তখন তারা ইখলাসের সাথে আল্লাহর আইন জারী করে। তারা কাজ ফাঁকি দেয় না। ঘুষ খায় না। যার যা হক তা যাতে সবাই পায় সেজন্য চেষ্টা করে। যারা আল্লাহর আইন অমান্য করে, তাদেরকে শক্ত হাতে পাকড়াও করে সংশোধন করার ব্যবস্থা করে। যারা সংশোধন হয় না, তাদেরকে আল্লাহর আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তি দেয়। ফলে চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, ঘুষ এবং সব রকম দুর্নীতি সমাজ থেকে উৎখাত হয়ে যায়। তখন মানুষ নিরাপদে জীবন যাপন করে এবং সুখে শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ পায়।

মানুষের সুখ-শান্তির জন্য দুটো বিষয় সবচেয়ে জরুরী বলে সবাই স্বীকার করতে বাধ্যঃ

১। বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা হলো মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হালাল পথে রুযী রোযগার করার মাধ্যমে এসব প্রয়োজন পূরণের সুযোগ সব মানুষ যাতে পায় সে ব্যবস্থা করা ইসলামী সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

রিযকের মালিক আল্লাহ পাক। ইসলামী সরকারকে তাঁরই খলীফা হিসাবে এ বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে হয়। রুযী রোযগারের সুযোগ দেবার পরও অনেক কারণে যাদের ঐ সব মৌলিক প্রয়োজনের অভাব

www.bjilibrary.com

থেকে যায়, তাদের জন্য বাইতুল মাল থেকে ব্যবস্থা করার দায়িত্বও সরকারের।

২। জান, মাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা হলো ইসলামী সমাজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যায়ভাবে ও বেআইনীভাবে কারো জান, মাল ও ইয্যতের উপর যাতে কেউ হামলা করতে না পারে এর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বও সরকারের। সৎ লোকের শাসন ছাড়া এ নিরাপত্তা সম্ভব নয়।

জান, মাল ও ইয্যতের উপর যুলুম বন্ধ করার একমাত্র পথই হলো সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা। বর্তমানে ইউনিয়ন থেকে রাজধানী পর্যন্ত দেশের সর্বত্র হাজারো রকমের অপরাধ হচ্ছে। সৎ লোকের শাসন না থাকায় অপরাধীরা শাস্তি পাচ্ছে না। অপরাধীদের দাপটে ভাল মানুষরা ভয়ে অস্থির। অসৎ শাসনের কারণে দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমনই সমাজে চালু হয়ে গেছে। সৎ লোকের শাসন ছাড়া এ মুসিবত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন উপায় নেই।

ইসলামী সরকারের চার দফা দায়িত্ব

আল্লাহ্ পাক সূরা আল হাজ্জ-এর ৪১ নং আয়াতে মযলুম ও নির্যাতিত সাহাবা কিরাম সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, "এরা ঐসব লোক যাদেরকে যদি আমি যমীনে ক্ষমতা দান করি, তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।"

এ আয়াত নাযিলের পরপরই রাসূল (সাঃ) মদীনায় হিজরত করেন এবং সাহাবা কিরামকে নিয়ে ইসলামী সরকার গঠন করে ঐ আয়াত অনুযায়ী ৪ দফা দায়িত্ব পালন করেন।

প্রথম দায়িত্ব হলো জনগণের চরিত্র গঠন। এর জন্য নামাযের চেয়ে বড় মাধ্যম আর কিছুই হতে পারে না। নামাযের উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে

www.bjilibrary.com

আল্লাহর গোলামীতে অভ্যস্ত করা। তাই আল্লাহ্ সূরা আনকাবুতের ৪৫ আয়াতে বলেন, "নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।"

দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা। যাকাতের উদ্দেশ্যই হলো সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা। ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তিই হলো যাকাত। যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতিই জনগণের ভাত-কাপড়-বাসস্থান-চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তা দিতে পারে।

তৃতীয় দায়িত্ব হলো সমাজের জন্য আল্লাহ্ পাক যা কিছু ভাল বলে জানিয়ে দিয়েছেন তা সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করে জনগণের মধ্যে চালু করা। শুধু ওয়ায ও নসীহত এ উদ্দেশ্যে যথেষ্ট নয়। যাদের উপর আদেশ ও নির্দেশ দেবার দায়িত্ব রয়েছে, তাদের যথাযথ ভূমিকা ছাড়া এ উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না।

চতুর্থ দায়িত্ব হলো সমাজ থেকে সব রকমের মন্দ কাজ খতম করা। ওয়ায-নসীহত দ্বারা এ কঠিন উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে মন্দকে সমাজ থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে যদি উপরোক্ত চার দফা দায়িত্ব পালনের যোগ্য সরকার কায়েম হয়, তবেই মানুষ সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাবার সুযোগ পাবে। তাই আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহর আইনের পক্ষে গণদাবী চাই

ইংরেজ শাসকদের সময় থেকে এ পর্যন্ত যারা দেশের সরকারী ক্ষমতা পেয়েছে, তারা সবাই নিজেদের মনগড়া আইনই চালু করেছে। তারা যদি আল্লাহর আইন পছন্দ করতো, তাহলে দেশের এ দুর্দশা হতো না। যারা আইন তৈরী করে তারা নিজেদের স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা বহাল রাখারই চেষ্টা করে। তারা নিরপেক্ষ হয়ে সব মানুষের জন্য উপকারী আইন রচনা করতে পারে না।

www.bjilibrary.com

একমাত্র আল্লাহই এমন এক মহান সত্তা যার নিজের স্বার্থ নেই। তিনিই একমাত্র নিরপেক্ষ। তাছাড়া সব বিষয়ে ইল্ম থাকার কারণে তাঁর কোন ভুল হয় না। তাই আল্লাহ পাক বলেন, "তোমরা যেটা অপছন্দ করছ হয়তো সেটা তোমাদের জন্য ভাল এবং যেটা পছন্দ করছ হয়তো সেটাই তোমাদের জন্য মন্দ। আর আল্লাহই বেশী জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা বাকারাহ-২১৬ আয়াত)।

এ কারণেই মানব রচিত আইন দ্বারা কোন কালেই মানুষের সুখ-শান্তি হতে পারে না। বার বার আইন বদলান হলেও অশান্তি দূর হয় না। তাই যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়ে তাঁদের মারফতে "আল্লাহর আইন" নাযিল করা হয়েছে। তাঁরা সমাজ থেকে একদল সৎ লোক তৈরী করে আল্লাহর আইন জারী করার চেষ্টা করেছেন। শেষ নবী (সাঃ) তেরো বছর চেষ্টা করে একদল সৎ লোক যোগাড় করে তাদেরকে সাথে নিয়ে মদীনায় আল্লাহর আইন চালু করলেন। দুনিয়া দেখতে পেল যে, "আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন" কায়েম হলে একটা অসভ্য ও বর্বর জাতি কিভাবে মানব জাতির সভ্যতার উস্তাদে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের জনগণ যদি বর্তমান অশান্তি, সন্ত্রাস, অবিচার ও দুর্দশা থেকে বাঁচতে চায় তাহলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়ায তুলতে হবে- "আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই।" এ গণদাবী ব্যাপক হলে সরকার আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করতে সাহস করবে না।

যারা আল্লাহর আইন চায় তাদেরকে সংগঠিত হতে হবে

এদেশের মুসলিম জনগণ আল্লাহকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, আল্লাহর কুরআনকে অন্তর দিয়ে ভক্তি করে এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই তারা চায় যে কুরআনের আইন চালু হোক এবং রাসূলের (সাঃ) দেয়া শান্তির বিধান জারী হোক। দেশের অমুসলিমরাও

www.bjilibrary.com

সুখ-শান্তি চায়। আল্লাহর আইন হলে তাদের জীবনেও যে শান্তি আসবে সে কথা তাদেরকে বুঝালে বুঝবে। আল্লাহর আইনে দেশ চললে তারাও শান্তিতে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে।

জনগণ যতই আল্লাহর আইন পছন্দ করুক তা নিজে নিজেই কায়েম হবে না। এর জন্য চাই গণঐক্য। জনগণ আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের পক্ষে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ না হলে শুধু মনে মনে চাইলেই তা চালু হবে না। এ মহান উদ্দেশ্যে যে জামায়াত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, সে জামায়াতের পরিচালনায় জনগণ যখন সংগঠিত হবে, তখনই জনগণের আশা-আকাংখা সত্যিকারভাবে পূরণ হওয়া সহজ হবে।

আল্লাহর আইন কায়েম হলে যারা তাদের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, শ্রেণীগত ও দলগত স্বার্থ নষ্ট হবে বলে মনে করে, তাদেরকেই কায়েমী স্বার্থ বলা হয়। কুরআনে তাদেরকে 'তাগূত' বলা হয়েছে। এসব তাগূতী শক্তি মানুষকে আল্লাহর গোলাম হতে বাধা দেয় এবং তাদের মরযীর গোলাম বানিয়ে রাখার চেষ্টা করে। মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি পেতে হলে জনগণকে সংঘবদ্ধ হয়ে তাগূতী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

নির্বাচনের মাধ্যমেই ইসলামী সরকার কায়েম করতে হবে

আল্লাহর রাসুল (সাঃ) মদীনার জনগণের সমর্থন নিয়েই ইসলামী সরকার গঠন করেছিলেন। তিনি অস্ত্র ও সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনা দখল করেননি। মদীনায় ইসলামী হুকুমাত কায়েম হবার পর মাক্কা থেকে কাফির ও মুশরিক বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ করতে আসল, তখন বদরের ময়দানে রাসূল (সাঃ) সাহাবা কিরামকে নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তিনি মদীনার জনগণের উপর জবরদস্তি করে সরকার কায়েম করেননি।

www.bjilibrary.com

তাই জামায়াতে ইসলামী শক্তি প্রয়োগ করে এবং অস্ত্র ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করে না। আল্লাহর রাসূল যেমন মদীনাবাসীদের সমর্থন নিয়েই সেখানে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করেছেন সে নিয়মেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে ইসলামী সরকার গঠন করতে চায়।

বর্তমানে সারা দুনিয়ায় নির্বাচনই জনগণের সমর্থন যাচাই করার একমাত্র সহজ ও শান্তিপূর্ণ উপায়। তাই জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশে ইসলামী সরকার কায়েম করতে চায়। যারা নির্বাচনে বিশ্বাসী, তারা অস্ত্র নিয়ে রাজনীতি করে না। যারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র দখল করে নির্বাচনে জিতবার চেষ্টা করে, তারা জনগণের উপর আস্থা রাখে না। তারা জনগণের সমর্থনে জিতবার আশা করে না বলেই জোর করে ভোট কেন্দ্র দখল করে ও ব্যালট ডাকাতি করে।

ব্যালট ডাকাতরা জনগনের দুশমন। তারা জনগণকে স্বাধীনভাবে তাদের মরযী মতো ভোট দিতে বাধা দেয়। ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী যে নির্বাচন হয়েছে তাতে জনগণ মোটামুটি তাদের ইচ্ছা মতো ভোট দিতে পেরেছে। কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ঐ নির্বাচন হওয়ায় ভোটাররা ব্যালট ডাকাতদের খপ্পর থেকে বাঁচতে পেরেছে।

জামায়াতে ইসলামীর সরকার কায়েম করতে হবে

এ কথা সবাই জানে যে, এ পর্যন্ত যে সব দল দেশ শাসন করেছে, তাদের কারো আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের কোন কর্মসূচীই নেই। তারা এ জাতীয় কথাও বলেন না। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে হলে কমপক্ষে তিনটি কাজ করতে হবেঃ

১। ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষিত মহলকে স্পষ্ট জ্ঞান দান করতে হবে। কালেমা তাইয়েবার বিপ্লবী দাওয়াত, নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাতের মতো বুনিয়াদী ইবাদতসমূহের হাকীকত ও উদ্দেশ্য এবং ইসলামী

www.bjilibrary.com

রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের জ্ঞান আধুনিক যুগের উপযোগী ভাষায় পরিবেশন করতে হবে, যাতে দুনিয়ার আর সব মত ও পথের সাথে তুলনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা সম্ভব হয়।

উচ্চ শিক্ষিত ও সুধী মহলের নিকট কুরআন পাককে এমনভাবে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা কুরআন মজীদকে সকল জ্ঞানের উৎস মনে করতে সক্ষম হন এবং ইসলামী সমাজ বিপ্লবের দিশারী ও গাইড বুক হিসাবে কুরআন হাকীমকে বুঝতে পারেন।

এ জাতীয় জ্ঞান চর্চার দ্বারাই মানুষ আল্লাহর আইনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

২। আল্লাহর আইন কায়েমের কঠিন দায়িত্ব পালনের যোগ্য এমন একদল লোক তৈরী করতে হবে, যারা ইসলামকে জানে এবং নিজেদের জীবনে ইসলামকে মেনে চলে। তাদের মন, মগজ, চরিত্র, অভ্যাস, চালচলন, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি কুরআন ও হাদীস মুতাবেক গড়ে তুলতে হবে। এ মহান উদ্দেশ্যে ঐ সব লোককে সংগঠিত করতে হবে যারা নিজেদেরকে দীন কায়েমের যোগ্য বানাতে চায়।

৩। এভাবে যে সব লোক তৈরী হতে থাকে তাদের মধ্যে ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে যারা অগ্রসর, তাদের হাতেই সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্ব দিতে হবে। ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে এ ভাবেই একদল সৎ ও যোগ্য নেতা তৈরী হবে।

সাধারণত দেখা যায় যে টাকার জোরে বা বিভিন্ন ধরনের প্রভাব, প্রতিপত্তির কারণে অসৎ, চরিত্রহীন, ক্ষমতালোভী ও দুর্নীতিবাজ লোকেরাও নেতা হয়ে জনগণের উপর শোষণ ও যুলুম করে। এ জাতীয় নেতাদের খপ্পর থেকে জনগণকে উদ্ধার করতে হলে সৎ, যোগ্য ও চরিত্রবান লোকদের নেতৃত্ব কায়েম করতে হবে। এ কারণেই সৎ লোকের শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে নেতৃত্বের উপযোগী লোক তৈরী করতে হবে।

www.bjilibrary.com

উপরে বর্ণিত তিনটি কাজ জামায়াতে ইসলামী বহুদিন থেকে করছে বলেই আজ ইসলাম ও কুরআনের চর্চা এত ব্যাপক হয়েছে, সকল মহলেই ইসলামী জ্ঞানের চর্চা বেড়ে চলেছে এবং ইসলামী মন-মগজ চরিত্রের লোকের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যদি দেশবাসী আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন চায় তাহলে তাদের এ আশা তখনই পূরণ হবে, যখন জামায়াতে ইসলামীর হাতে দেশ পরিচালনার ক্ষমতা আসবে।

নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণই ফায়সালা করে যে কাদের হাতে ক্ষমতা দেয়া উচিত। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভোটের দ্বারা জনগণ জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে বি, এন, পি'র হাতে দিয়েছে। জনগণ যদি আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন চায়, তাহলে তারা ভোটের দ্বারাই জামায়াতে ইসলামীর হাতে ক্ষমতা তুলে দেবে।

www.bjilibrary.com

দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণ 'আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন' কায়েম করার জন্য আজীবন জিহাদ করেছেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশও এদেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

সেই জিহাদী দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আপনিও জামায়াতে ইসলামীর কাফেলায় শরীক হোন।

www.bjilibrary.com

লেখকের অন্যান্য বই

১। কুরআন বুঝা সহজ
২। আমপারা (তাফহীমুল কুরআনের সার সংক্ষেপ)
৩। ২৯ পারা (তাফহীমুল কুরআনের সার সংক্ষেপ)
৪। সীরাতুন্নবী সংকলন
৫। নবী জীবনের আদর্শ
৬। ইসলামে নবীর মর্যাদা
৭। বিশ্বনবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি
৮। বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি
৯। রাহমাতুললিল আলামীন
১০। ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন
১১। ইকামাতে দ্বীন
১২। ইসলামী আন্দোলন– সাফল্য ও বিভ্রান্তি
১৩। বাইয়াতের হাকীকত
১৪। রুকনিয়াতের দায়িত্ব
১৫। জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
১৬। বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
১৭। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী
১৮। অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
১৯। বাংলাদেশের ভবিষ্যত ও জামায়াতে ইসলামী
২০। আমার দেশ বাংলাদেশ
২১। বাংলাদেশের রাজনীতি
২২। বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই
২৩। পলাশী থেকে বাংলাদেশ
২৪। ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান
২৫। আধুনিক পরিবেশে ইসলাম
২৬। কিশোর মনে ভাবনা জাগে
২৭। ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ
২৮। মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়
২৯। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ
৩০। A guide to Islamic Movement
৩১। ২৮ পারা (তাফহীমুল কুরআনের সারসংক্ষেপ)
৩২। জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

- আল্লাহর দ্বীন কায়েমের এক বিপ্লবী দাওয়াত
- ইসলামী জ্ঞান চর্চার এক নিখুঁত পরিকল্পনা
- উন্নত চরিত্র গঠনের এক মজবুত সংগঠন
- জনসেবা ও সমাজ সংস্কারের এক বাস্তব কর্মসূচী
- আদর্শ রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের এক বলিষ্ঠ আন্দোলন

দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে
আপনিও এ আন্দোলনে শরীক হোন